মালাকরহীন কাননে নীলাঞ্জনা ডালিয়া - ৪

হিফজুর রহমান

[আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন]

আবারো গাঢ় সবুজ খাম। প্রেরকের নাম লেখা শুধুই ডালিয়া। লেখা অত্যন্ত চমৎকার। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ওর নাম। খামটা গাঢ় সবুজই বেছে নিল কেন? ওইদিন কি কোনভাবে বলেছিল দেবাশীষ যে সবুজ ওর প্রিয় রং। নাকি ওর গাঢ় দৃষ্টিই বুঝিয়ে দিয়েছিল সবুজের প্রতি ওর বিশেষ আনুকূল্য?

খামটা নিয়ে নিজের অফিস কক্ষে ফিরলো ও খানিকটা ঘোরের মধ্যেই। কোন দিকে না চেয়ে খামটা খুললো লেটার ওপেনার দিয়ে অত্যন্ত যত্নের সাথে। একটা কার্ড এবং একটা কয়েক লাইনের চিঠি। কার্ডে আমান্দা ব্র্যাডলীর উদ্ধৃতি,"সামওয়ান হু টেকস টাইম টু থিঙ্ক আদার পিপলস নিডস অ্যান্ড ওয়ার্মস সো মেনি হার্টস উইথ জেন্টল ওয়র্ডস অ্যান্ড থটফুল ডীডস....." । চিঠিটার ওপর চোখ বুলালো দেবাশীষ, ওতে লেখা, "হাউ আর ইউ? ওকে? হানড্রেড পার্সেন্ট? হাউ ওয়জ ইয়োর টাইম ইন লাস্ট টু ডে'জ? আমাকে একটা সুন্দর সময় দেয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আপনি গালে হাত দিয়ে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে আমার কথা শুনতে শুনতে আবার কোন দূরে হারিয়ে যাচ্ছিলেন। আবার ফিরে আসছিলেন আমার কাছে। আপনার মৃদু হাসি আপনার অসুস্থতাকে ছাপিয়ে যাচ্ছিলো। আমার কখনো স্বপ্নেও মনে হয়নি আপনার মতো কারো সাথে দেখা হবে..কখনো। আমি আমার ফীলিং-এর কথা বলবো কি করে? ওটা প্রকাশ করার সাধ্যও আমার মধ্যে নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনার মতো মানুষকে কাছে পেলে যে কারো জীবন ধন্য হবে বা হতে পারে। আবার কি দেখা হবে?

ইতি ডালিয়া।

একটু হাসলো দেবাশীষ। ওর মতো মানুষকে কাছে পেলে কারো জীবন ধন্য হতে পারে একথাটাইতো বোধহয় প্রথম জানলো ও। যদি অর্পিতাকে দেখাতে পারতো ও এই চিঠিটা! একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলা যেন ওর মন থেকে। এই জনমে সেটা বোধহয় আর হবার নয়। বাইরের জগতে ব্যাপক জনপ্রিয় দেবাশীষ কখনোই অর্পিতার মন জয় করতে পারেনি। অ্যাতো বছরে যখন পারেনি আর পারবার আশাও করেনা ও। আর এরই মধ্যে ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে অর্ক। দশ বছরের অর্কই বরং এখন একটুখানি হলেও দেবাশীষের সান্তনার স্থল। আবারো গাঢ় সবুজ খামে মোড়া চিঠি আর কার্ডটার ঘোরে পড়ে গেল। গোটা দিনের কাজ সারলো ঘোরটা মাথায় নিয়েই। অফিসের নিয়মিত কাজগুলো সেরে নিলো, এরই মধ্যে। তার পর আবার ঘরে ফেরা।

ঢাকা ডাউন টাউনের ঘরে ফেরাটা অনেকটা অভ্যেসের মতো হয়ে গেছে দেবাশীষের। ঘর আছে তাই ফিরতে হয়। গাড়িতে বসে যথরীতি সীটে মাথাটা এলিয়ে দেয় ও। ঘরে ফিরতে লেগে যায় প্রায় আধঘন্টা কি চল্লিশ মিনিট। এই সময়টুকু ওর ক্লান্ত শরীরে ঘুমের শান্তি এসে যায়। ফ্ল্যাটবাড়ির নিচের ড্রাইভওয়েতে পৌঁছুনোর পর চালক অপু আস্তে করে ডাক দেয়,'স্যার, আইস্যা গেছি।' ঘুম ভাঙে দেবাশীষের। ল্যাপটপের ব্যাগটা হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ধীরে ধীরে ওপরে ওঠে ও। তিন তলার একটা ফ্ল্যাটে বাস ওর। মোট কুড়িটা ফ্ল্যাট এই বিল্ডিংয়ে। ঢাকায় এখন ফ্ল্যাট কালচার বেশ চালু হয়ে গেছে। এই বিল্ডিংয়ের সব পরিবারের

কাছেই অত্যন্ত প্রিয় মানুষ দেবাশীষ, বিশেষ করে কাচ্চা-বাচ্চাদের প্রিয় চাচু বলতেই দেবাশীষ।

বাসায় ঢুকে দেবাশীষ দেখে অর্ক যথারীতি কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে ওর ঘরে। কি একটা গেম নিয়ে নিবিষ্ট ও। জুতো-মোজা খুলে র‍্যাকে রেখে দেয় ও। তারপর ওর ছোট্ট স্টাডিতে ব্যাগটা রেখে আসে বেডরুমে। স্টাডিটাই দেবাশীষের ছোট্ট কিন্তু একান্ত আপনার জগত। এই জগতটাতে ও কখনো কখনো একেবারে একাকি হয়ে যায় বা যেতে চায়। সবসময় যে হয় তা নয়, তবুও যতোটুকু পারে। অর্পিতা একটা টিভি সিরিয়াল দেখতে দেখতে ঘুমে কাদা। টিভিটা আপন মনে চলছে। লাগোয়া বাথরুমটায় ঢুকে পড়ে ও। অর্পিতা প্রতিদিনের মতোই একান্ত নিয়মে ওর ঘরে পরার টি-শার্ট আর ট্রাউজারটা রেখে দেয়। দেবাশীষ কাপড় বদলায় বাথরুমেই,

এটাই ওর নিয়ম। কাপড় বদলে একেবারে মুখ-হাত ধুয়ে বেরোয় ও। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামতে অনেক দেরি এখনো। কফি-নাশতা অর্পিতা উঠলে পরেই হবে। টিভিটা অফ করতে গিয়েও করেনা ও।

অর্কর ঘরে গিয়ে একবার ওর এলামেলো চুলগুলো আরো এলোমেলো করে দিয়ে আসে ও। অর্ক বলে,'বাপী, অ্যাতো বিরক্ত করো না তুমি,' বলে মুখটা একটু ভেঙচে দেয়। তারপরই উপহার দেয় একটা মিষ্টি হাসি। অর্কের সাথে দেবাশীষের সম্পর্ক বন্ধুর মতো। তবে, কম্পিউটারে থাকলে কোন দিকে ওর নজর থাকেনা। এই দিক থেকে ও হয়েছে ওর বাপীর মতো, কম্পিউটার ফ্রীক। এরপর দেবাশীষ সঞ্জীবের লোটা কম্বল দ্বিতীয় খন্ড নিয়ে স্টাডিতে ঢুকে পড়ে। ওর বইপত্র খানিকটা স্টাডিতে আর স্থানাভাবে খানিকটা ঠাঁই করে নিয়েছে অর্কের ঘরে। এদিকে স্টাডিতে একটা অতি সিঙ্গেল খাট বিছিয়ে নিয়েছে ও। শুয়ে শুয়ে বই পড়ার অভ্যেস ওর। সারাজীবন টেবিল চেয়ারের ধারে ঘেঁষেনি ও পড়া-লেখা করবার সময়। এটাই ওর বিলাস।

একবার মনে হয় সবুজ খামের চিঠিটা ব্যাগ থেকে বের করে আরেকবার পড়ে ও। কিন্তু অর্পিতার চোখে পড়ে যাবার ভয়ে আর বের করেনা। লোটা কম্বলেই নাকটা ডুবিয়ে দেয়।

দু'তিনটা দিন একটু কাজের চাপ পড়ে গিয়েছিল। ওদের কোম্পানীর একটা বড়ো ডেলিগেশন আসছে, প্যারেন্ট দেশ থেকে। সারা অফিসই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তবে, ওর আর পিটারের একেবারে শিরে-সংক্রান্তি। অধিকাংশ দায়িত্ব ওদেরই ওপর। আর বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে কোন প্রোগ্রাম ফাইনাল করাটা যে কি কষ্টের কাজ সেটা যে করেনি সে কোনদিনও বুঝতে পারবেনা। এই ঝামেলার মধ্যে ডালিয়ার কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিল। এরই মধ্যে আবার সবুজ খাম। এবারের চিঠিটা শাদা কাগজে লেখা। কোন কার্ড নেই। শুধু চিঠি। সব কাজ দুহাতে সরিয়ে রেখে চিঠিটা পড়তে লেগে গেল ও।

"প্রিয় দেবাশীষ দা,

ভেবেছিলাম আপনার কাছ থেকে কোন চিঠি না পাই অন্ততঃ একটা কল পাবো। না পেয়ে মনে হলো, আমার আদিখ্যেতা আপনার মনঃপুত হয়নি। হয়তো আমার চিঠি বা কার্ড পাঠানো আপনাদের নিয়মমতোও হয়নি। কিন্তু, কি করবো বলুন? মনের ওপরতো কারো হাত নেই। তাই আবারো নির্লজ্জের মতেই এই চিঠিটা লিখছি। সেদিন ঝুম বৃষ্টি ছিল। একটা রিক্সায় করে সোজা গুলশানে আপনাদের অফিসের দিকে চলে গিয়েছিলাম। রিক্সার পরদা ছিল তারপরও বৃষ্টি আমাকে পরম আদরে জড়িয়ে ধরছিল বারবার। বৃষ্টি অনেক দেখেছি, কিন্তু বড়ো হবার পর অ্যাতো আনন্দ বৃষ্টিতে ভিজে আর কখনো পেয়েছি কি না সন্দেহ। বিবাহিত জীবনেতো এরকম বৃষ্টিতে ভিজে আনন্দ করার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বৃষ্টির যে রোমান্টিকতা, সেটা বুঝতেও তো মন দরকার। আচ্ছা আপনার কি বৃষ্টিতে ভিজতে ভালো লাগে? আপনিতো আবার বড়ো মাপের বড়ো অফিসার। আপনার কি বৃষ্টিতে ভেজা সাজে! খুব মজা করেছিলাম। জানতাম আপনার সাথে দেখা হবেনা, তারপরও আপনাদের অফিসের বুড়ি ছুঁয়েতো আসতে পারলাম! ভেবেছিলাম অনেকদিন পর এমন ভিজেছি, হয়তো জ্বর হবে। নাঃ হয়নি শেষপর্যন্ত। হলে কর্তার বকুনি খেতে হতো। এসব ওর কাছে নিতান্তই ছেলেমানুষি।

যাকগে, আপনি ভালো আছেনতো? ইচ্ছে করলে দু'কলম লিখবেন। ইংরেজীতো সারাটাক্ষণ লিখছেনই। বাংলা কেমন লেখেন একবার দেখিনা। অপেক্ষায় রইলাম।"

প্রথমে কিছুক্ষণ নিথর হয়ে রইলো দেবাশীষ। আচ্ছা ডালিয়া যদি জানতো দেবাশীষও বৃষ্টিতে ভিজতে ভালোবাসে। ঝুম বৃষ্টি হলেই ও ওদের বিল্ডিংয়ের সব ছেলে মেয়েকে নিয়ে ছুট দেয় ছাদের দিকে। চিঠিটা পেয়ে একটু ভালো লাগা আবার একটু কুণ্ঠা গ্রাস করলো ওকে। শেষপর্যন্ত সবকিছু ঝেড়ে ফেলে শাদা এ-ফোর অফসেট কাগজ কয়েকটা টেনে নিলোও, সঙ্গে কলম। সাধারণতঃ ও হাতে প্রায় লেখেইনা বললে চলে। তারপরও আজ আর যন্ত্রের লেখা পাঠাতে মন চাইলোনা। পপিকে ফোন করে বলে দিল খুব জরুরী না হলে কোন ফোন যাতে না দেয়। পিটারও আসবেনা। ও বাইরে গেছে কোন মিটিংয়ে। অন্য সহকর্মীরা ওকে ব্যস্ত দেখলে আর ওর রুমে ঢুকবেনা। ওদের অফিসে এমনিতে নিয়ম আছে ঘরে ঘরের মালিক উপস্থিত থাকলে ঘরের দরজা বন্ধ না করার। একমাত্র বাইরে গেলেই দরজা লক করে দিয়ে যেতে হবে।

চিঠিটা আদৌ পাঠানো হবে কিনা জানেনা, তবুও দেবাশীষ একমনে লিখে চললো,"কাল ঢাকা শহরের একটি জায়গায় সন্ধ্যের কনে দেখা আলো মিলিয়ে যেতে না যেতেই পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ভেলা ভেসেছিলো অন্ধকার আকাশে। এমন সময় চাঁদটাও মুখ লুকালো ওদের আড়ালে।

'একটা মুনিয়া পাখী বসে ছিল একটা পাকা চাতালের ওপর। ওর ঠোঁটে ছিল সুন্দর সূর। আর মাঝে মধ্যেই পাখীটা হাসির ঝর্ণায় ভেঙে পড়ছিল, আর চারদিকে বাজছিল অত্যন্ত হালকা রিমঝিম বৃষ্টির সূর। এক চাতক বসে ছিল একেবারে মুনিয়াটার পাশ ঘেঁষে।

'আকাশে কখনো কখনো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। চাতক ভেবেছিল, আজ বর্ষা নামবে অনেক। কারণ ওর যে ছিল আকণ্ঠ পিপাসা। এরই মাঝে চাঁদটা থেকে থেকে মেঘের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছিল। চাঁদটা বোঝেনি বা বুঝেছিল হয়তো, মুনিয়াটাকে আরো কতো সুন্দর দেখাচ্ছিল!

'অনেক বর্ষা নামেনি। কিন্তু, যেটুকু নেমেছিল তাতেই সিক্ত হয়েছিল চাতক। ও ভাবেওনি, এই অল্প বর্ষাই ওর পিপাসা মিটিয়ে দেবে। কিন্তু, চঞ্চল হয়ে উঠেছিল চাতক। মনে হচ্ছিল, হোক খুবই অল্প। তবুও বর্ষা ঝরতেই থাকুক। কারণ, ওই বর্ষাতো ঝরছিল শান্তির বারি হয়ে।

'মুনিয়াও চঞ্চল ছিল। তবে ওর অদম্য চেষ্টা ছিল সব চাঞ্চল্য ধরে রাখতে। ঠিকই করেছিল হয়তো। নয়তো চাতক ওর চিরকালীন খোলস ভেঙে উদ্দাম ময়ূর নৃত্যে মেতে উঠতো। তাতে মুনিয়া আরো চঞ্চল হতো। আকাশে মেঘ গর্জাতো, বিদ্যুৎ চমকাতো। তারপর বর্ষার প্লাবন নেমে আসতো। কিন্তু, কিছুই হলোনা।

'একসময় মুনিয়া আর চাতক উড়ে গেল ওদের নিজ নিজ কোটরে। চাতক অনেক স্বপ্ন নিয়ে এক সময় নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়লো, তার বুক ভরা ছিল এক ছোট্ট, অনির্বচনীয় সুন্দর মুনিয়ার স্বপ্ন।

'চাতক স্বপ্নে আরো দেখছিল, একদিন আরো অনেক বিদ্যুৎ চমকাবে, মেঘ গর্জাবে। আর প্লাবনের মতো ধেয়ে আসবে বর্ষা। সিক্ত, শান্ত করে দেবে ধরণীকে। দেবাশীষ"

[লেখকের পরিচিতি জানতে এখানে টোকা মারুন]

(চলবে)